বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পরিস্থিতিঃ কিছু ভাবনা

ড. রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক (১২ জুন, ২০১৪)

বাংলাদেশে 'গণতন্ত্র' একটি সর্বস্তরের মানুষের আলোচনার বিষয় - খবরের কাগজ, সভা-সেমিনার-টিভি টকশো – সবখানেই নানামুখী বিশ্লেষণ, মতামত, পরামর্শের ঝড় বয়ে যায়। এর ভিড়ে এই আলোচনায় আরও নতুন কিছু যুক্ত করা বেশ কঠিন। তারপরও আমি আজ এখানে এসেছি কিছু বলতে। ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক এদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও দৃঢ় ভূমিকা রাখছে, তাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করে আমি আমার ধন্যবাদ দেওয়ার একটি সুযোগ পেয়েছি। আমি আমার গবেষণা কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রোফাইলের ব্যাপারে সুজন প্রস্তুতকৃত তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছি।

গণতন্ত্রের প্রাথমিক পূর্বশর্ত

বক্তব্যের শুরুতেই আমি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের একেবারে প্রাথমিক পূর্বশর্ত রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু উদ্বেগের কথা উল্লেখ করতে চাই। গত কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের বক্তব্য, চিন্তাবিদদের লেখনীতে, টিভি টকশোর আলোচকদের কথা থেকে এই উদ্বেগগুলো বের হয়ে এসেছে। **প্রথমতঃ** আমি মনে করি যে, আমরা যদি নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক মনে করি তাহলে আমাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত রয়েছে বলে আমাদের এক ধরনের আস্থা থাকা উচিত। তারপরও আমি প্রায়ই শুনতে পাই মিডিয়া বা সুশীল সমাজের কর্মীরা শঙ্কা প্রকাশ করেন যে, স্বাধীনভাবে সত্য কথা বলা একটি ভীষণ ঝুঁকির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া দুর্নীতি বা অপরাধ উন্মোচন অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী কথা বলার কারণে মিডিয়া বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে হুমকি বা হয়রানির বিভিন্ন ঘটনাও আমরা দেখেছি। যদি মিডিয়া বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করেন যে, তারা তাদের কথা বলার স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাহলে দেশের গণতন্ত্রের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বৈকি। গত দুই দশক ধরে গণতন্ত্রের একটি মাত্র সূচকেই আমরা উন্নতি করেছি আর তা ছিল 'voice' বা কথা বলার স্বাধীনতা। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যখন গণতন্ত্রের অন্যান্য সূচকগুলোর (যেমন, আইনের শাসন) পরিস্থিতি দিন দিন অবনমন হচ্ছে, তখন এই এক কথা বলার বা মত প্রকাশের স্বাধীনতাই আমাদের রাজনীতি বা সুশাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পেরেছে। তাই কথা বলার স্বাধীনতার ওপর কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে, কেননা তা না হলে এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ আরেকটি কথা সম্প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হলো – উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দেশের শাসনব্যবস্থায় নাকি সরকার অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এই ''সরকার অব্যাহত রাখার" কথাটি কিন্তু উদ্বেগজনক। দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নীতি কাঠামোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে যেসব নীতি সুফল বয়ে আনে, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই ভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে তারা কোনো সরকারকে অব্যাহত রাখবে না পরিবর্তিত করবে। ভোটাররা মাঝে মধ্যে ভুল করতেই পারে এবং ভাল একটি সরকারের পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে ভুলের মাশুল ভোটারদের দিতে হবে। যেমন, ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা আল গোরের পরিবর্তে জর্জ বুশকে নির্বাচিত করে, যার জের তারা টেনেছে। এমনকি এই ২০১৪ সালের ভারত নির্বাচনে জনগণ কংগ্রেসের পরিবর্তে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে ভালো করলো কি খারাপ করলো তাও সামনের সময়ই বলে দেবে। তবে এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো যে, নাগরিকের প্রতিনিধি পছন্দ করার অধিকার ও কর্তৃত্ব তাদের নিজেদের হাতে

থাকতে হবে। ফলে তাদের পছন্দই সকলকে মেনে নিতে হবে। নিয়মিত অবাধ ও শুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করাকে যখন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়, তখন আশা করা হয় ভোটাররা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং ভুল করলে তা পরবর্তী নির্বাচনে সংশোধন করে নিবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের ওপর এই আস্থাটুকু রাখতে হবে যে, তারা তাদের পছন্দ করার স্বাধীনতার সুষ্ঠু ব্যবহারই করবে।

তৃতীয়তঃ সম্প্রতি আমি আরও একটা বিষয় খেয়াল করছি যে, গণতন্ত্রের কিছু উপাদান যা কিনা একসাথে কাজ করা উচিত সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রাধিকার (priority) বা পারম্পর্য (sequence) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেমন- অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনের সাথে অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি দু'টি অবিভাজ্য উপাদান এবং অতি অবশ্যই তাদেরকে একসাথে আসতে হবে। দেশে যদি সার্বক্ষণিক সহিংস পরিস্থিতি বিরাজ করে অথবা কিছু সম্প্রদায়কে অবিরতভাবে সহিংসতার শিকার হতে হয় – এরকম একটি পরিস্থিতিতে কখনোই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। আমাদের দেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ যে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে তার একটি কারণ হলো আমরা কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, বাকিগুলোকে পেছনে ঠেলে সরিয়ে রাখছি।

অতীতে আমরা শুধু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ওপরই সব জোর দিয়েছি, ফলে আমাদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের মতো একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়ে এত বেশি নজর দেয়া হয়নি। বিগত বেশ কিছু গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে আমরা লক্ষ করেছি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দিকটি অতি দুর্বল। সব নির্বাচিত সরকারই নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেশের প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ এই ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং সংসদ অধিবেশন বয়কট করেছে। বিরোধী দল সংসদীয় আলোচনা বা বিতর্কে অংশগ্রহণ না করে রাস্তায় সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছে। নির্বাচিত সরকার পক্ষ তার সমর্থকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার সুযোগ দিয়েছে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের শাস্তির আওতায় নিয়ে এসেছে। ফলে দেশের নির্বাচন এখন ''বিজয়ীর সকল সুবিধা" (winner takes all) ধরনের একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দল পাঁচ বছর পরের নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা না করে এক বছর পার হতে না হতেই সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে দেয়। দলের কর্মী-সমর্থকরা ক্রমাগতভাবে অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় কোন্দলে ও সহিংস আক্রমণে জড়িয়ে পড়ে যার ফলে বহু আহত-নিহতের ঘটনা ঘটছে। উপরে উল্লেখিত এসকল চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ঘটনাগুলো বছরের পর বছর ধরে গণতান্ত্রিক শাসনামলেই ঘটে চলেছে।

আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, যেখানেও এই গণতন্ত্রের পরিস্থিতি বিষয়টি নিয়েই কথা বলেছিলাম। আজকে আমি আমার সেই বক্তব্য থেকেই কিছু অংশ আবার তুলে ধরবো। সেই বক্তব্যে আমি বলেছিলাম যে, আমার মনে হয় না আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কোনো সহজ পথ বা 'একটি মাত্র' ম্যাজিক বুলেট রয়েছে।

দশম সংসদ নির্বাচনের পর সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো– প্রধান দলগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বিশ্বাসযোগ্য সংসদীয় নির্বাচন। যদিও এমন একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করাটা সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন এবং এ সমস্যা আমাদের গণতন্ত্রের যাত্রাকে প্রতিনিয়ত বিচ্যুত করছে, তবুও আমি মনে করি না যে, নিছক একটি স্বাধীন এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেই আমরা আমাদের গণতন্ত্রের গভীরে প্রোথিত সমস্যাগুলির সমাধান ঘটাতে পারবে।

আমি মনে করি, আগামী নির্বাচনের পূর্বে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রথমেই 'winner-takes all' 'বিজয়ী দল সব নেবে' এই সংস্কৃতি চর্চা পরিত্যাগের ব্যপারে একমত হওয়া এবং প্রতিহিংসাও সহিংসতার রাজনীতি পরিত্যাগে নিজেদের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আমাকে যদি এক বাক্যে আমাদের গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধানের উপায় কী তার উত্তর দিতে বলা হয়, তাহলে আমি বলবো এখন আমাদের প্রধান কাজ হবে আমাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের 'গণতন্ত্রীকরণ' প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নেওয়া।

নির্বাচনী গণতন্ত্রকে 'গণতন্ত্রীকরণের' চ্যালেঞ্জ

কেবল বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের জন্যই নির্বাচনী গণতন্ত্রের 'গণতন্ত্রীকরণ' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাকে একটি শক্ত কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতন্ত্র মান বিশ্লেষণকারী বিভিন্ন সমীক্ষায় অনেক নির্বাচনী গণতন্ত্রকে নিম্ন মানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিছু কিছু দেশ যেমন, ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের গণতন্ত্র এখন এমন পর্যায়ে উন্নতি সাধন করেছে যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ছক নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে, তারপরও সেখানে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অপর্যাপ্তই রয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচনভিত্তিক ও দলীয় রাজনীতিতে সন্ত্রাস, দুষ্কৃতিকারী ও কালো টাকার মালিকদের অপতৎপরতার প্রাধান্য দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশেই তা এক কেন্দ্র বিশিষ্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় যাই হউক, তার শাসনব্যবস্থার প্রবণতা হলো– এরা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং পুরো শাসনব্যবস্থাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক।

বাংলাদেশে শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ নির্বাচনী গণতন্ত্রের মান উন্নত করার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাবের আলোচনা করছেন। নির্বাচনী ও দলীয় রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণের উপর অনেকেই জোর দিচ্ছেন। আমিও এই কাজটিকে অগ্রাধিকার দেব।

দলীয় ও নির্বাচনী রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণ

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের গুণগত উন্নতি সাধনে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। পরম্পরাগত রাজনৈতিক উত্তরাধিকার আধিপত্যবাদী রূপ হিসেবে দলীয় নেতৃত্বে আবির্ভূত হয়েছে। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পরম্পরাগতভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া দু'টি প্রধান দল – আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

যদিও সকল দলের গঠনতন্ত্রে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা/নেত্রী নির্বাচনের কথা আছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে পরামর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে নির্বাচন হয় অনিয়মিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হাতেই রয়ে গেছে। সাধারণত দলীয় কর্মসূচি এবং নির্বাচনী ইশ্তেহার কিছু পেশাদার ও কতিপয় নেত্রীবৃন্দের পরামর্শের ভিত্তিতে

প্রণয়ন করা হয় এবং এগুলো খুব কমই দলের অভ্যন্তরে অথবা জনসম্মুখে বিতর্ক-আলোচনার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বিভিন্ন নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীয় ফোরামে খুব সামান্য বিতর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রচুর সংখ্যক কর্মী থাকে, কিন্তু তারা বেশিরভাগই কেবল নির্বাচনকালীন ও গণআন্দোলনকালীন প্রচারণার ক্ষেত্রে নিছক জনশক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হন।

বিগত দশ বছরে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সমস্যাগুলো, যেমন দলের অর্থায়ন, কর্মী নিয়োগ দান, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, দলের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপদল ও তাদের কোন্দল এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০০৪-২০০৬ সালে সিপিডি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নাগরিক কমিটির ব্যানারে অনেকে রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছে এবং অনেক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও করা হয়েছে। কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এসব বিষয়ে কোনো সুনির্ধারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য দু'টি দল তথা বিএনপি ও জাতীয় পার্টি, নিজ নিজ দলীয় কাউন্সিলের নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও তৎপর নন ।

অদ্যাবধি বিএনপি মাত্র পাঁচটি দলীয় কাউন্সিল সভা (প্রতি ছয় বছরে একটি করে) আয়োজন করেছে, যদিও দলটির গঠনতন্ত্রে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর কাউন্সিল সভা করার শর্ত রয়েছে। ১৯৯৩ ও ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত বিএনপির গত দুই কাউন্সিল মিটিং এর মধ্যে ১৬ বছরের ব্যবধান ছিল। আওয়ামী লীগ তার ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল মিটিংয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক নিয়মিত, কিন্তু এসব বৈঠক শুধু নিছক বড় বড় জনপ্রদর্শনীতে পর্যবসিত হয়েছে, যেখানে দলের সভাপতি (শেষ দু'টি সভায় সাধারণ সম্পাদকও) সর্বসম্মতিক্রমে কণ্ঠভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এরপর দলীয় কাউন্সিল অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের কর্তৃত্ব দলের সভাপতির হাতে ন্যস্ত করে।

আন্তঃদলীয় ও অন্তর্দলীয় সহিংসতা সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই আমরা ব্যাপক আকারে দেখেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ এই ধরনের সহিংসতা ও সংঘাতের সাথে সম্পৃক্ত। কিছু সহিংসতা ঘটে দুই দলের মধ্যে আর কিছু সহিংসতা ঘটে দলগুলোর অভ্যন্তরে। অনেক ক্ষেত্রেই সংঘাত মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে ঘটে না, বরং অর্থ-অনুদানের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঘটে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর গবেষণা করতে গিয়ে আমি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তর্দলীয় সংঘাতের ঘটনা আন্ত ঃদলীয় সংঘাতের চেয়ে বেশি। তাছাড়া অন্তর্দলীয় সংঘাতের ঘটনা বিরোধী দলের তুলনায় ক্ষমতাসীন দলগুলোর মধ্যে বেশি। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তর্দলীয় সংঘাতের বেশিরভাগই আধিপত্য বিস্তার ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ এবং ফেনীর ঘটনা আবার আমাদের অন্তঃদলীয় সংঘাতের ঘটনা কত ভয়াবহ হতে পারে তা মনে করিয়ে দিয়েছে।

আমাদের দেশের নির্বাচনী রাজনীতি ক্রমশ পৃষ্ঠপোষকতার (patronage-based) রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যেখানে টাকা এবং পেশিশক্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগে সাধারণত ব্যবসায়ীগণ নির্বাচনী প্রচারণার তহবিলে আর্থিক সহায়তা দিতেন; কিন্তু বর্তমানে তারা ক্রমশ নির্বাচনী রাজনীতিতে সরাসরি দলীয় প্রার্থী হিসেবে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার লক্ষ করলে দেখা যায় ১৯৭৩ সালে ২৪ শতাংশ থেকে ১৯৯৬ সালে ৪৮ শতাংশ এবং পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালে ৫৭ শতাংশ থেকে ২০০৮ সালে ৫৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুষ্কৃতিকারীরাও রাজনীতিতে এক ধরনের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং সকল রাজনৈতিক দলই ব্যাপক হারে বিভিন্ন এলাকায় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তা ব্যবহার করে চলেছে। দলগুলোর ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে এবং এই দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এসব দুষ্কৃতিকারীদের অনেকেই আবার পরবর্তী সময়ে দলের নেতৃস্থানীয় জায়গায় আসীন হয়। বিভিন্ন সময়ের খবর কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা দেখেছি যে, নির্বাচিত সরকারগুলো বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজ দলীয় দুষ্কৃতিকারীদের রক্ষার কাজে এবং রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষ দলের দুষ্কৃতিকারীদেরকে বিতাড়িত করতে ব্যবহার করেছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা আরও জেনেছি যে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে প্রশ্রয় পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারি সংস্থা থেকে চাঁদা আদায় করে। টাকা ও দুষ্কৃতিকারীদের এই আধিপত্য বিশেষ করে নারী ও স্বল্প আয়ের মানুষদেরকে নির্বাচনী রাজনীতি থেকে এক রকম বের করে দিয়েছে। যদিও এদেশের মোট ভোটারের বেশিরভাগই নারী এবং স্বল্প আয়ের জনগণ, তারপরও রাজনীতির কোনো পক্ষই এই দুই গোষ্ঠীকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। এভাবে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, দুষ্কৃতিকারী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে একটা দুষ্ট চক্র গড়ে উঠেছে এবং তারা নির্বাচনী গণতন্ত্রের ভেতর দিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় নিবাচন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় দলীয় ও নির্বাচনী রাজনীতিতে টাকা ও অপরাধীদের প্রাধান্য কমিয়ে আনতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কিছু সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপসমূহ দলগুলো পুরোপুরি মানছে না এবং তাদের এই সব নিয়ম মানতে বাধ্যও করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ড অর্থায়ন বা সংঘাত নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে এখনও ভালভাবে চিন্তা করা হয়নি। আমি মনে করি, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং গবেষকদের এ বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখতে হবে।

উপসংহার

একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার জন্য আমাদের যে প্রবল জনসমর্থন রয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। সর্বশেষ দুই বছরের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধয়ক সরকারের আমলে এই জনসমর্থন আরও শক্তিশালী হয়েছে যার ফলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ অনুধাবন করে যে, নির্বাচনী গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া গণতন্ত্রের নতুন যাত্রার মাধ্যমে আশা করা হয়েছিল যে, বিগত সময়ের অনেক অগণতান্ত্রিক চর্চা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো এবং নির্বাচনী গণতন্ত্রকে আরও সুসংহতকরণে আমরা সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবো। আমরা এক রকম আশা পোষণ করছিলাম যে, দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং তাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বিগত দিনের ভুল পদক্ষেপের ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন এবং তারা নির্বাচনী গণতন্ত্রের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার কিছু মৌলিক নিয়ম অনুশীলনের ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হবেন। দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তীতে, বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতৃত্ব

এখনো পর্যন্ত সংঘাতের পথে অবস্থান করছেন, এমনকি তারা নির্বাচনী গণতন্ত্রের মৌলিক নিয়মনীতির ব্যাপারেও একমত হতে পারছেন না।

সৌভাগ্যবশত সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে অতীতের অপরাজনীতির ধারা থেকে বের হয়ে আসার জন্য এক রকম সচেতনা তৈরি হয়েছে, যা আমাদের দেশের জন্য সুশাসনের পথ সুগম করবে। মানুষ উত্তরোত্তর পুরোনো ধারার সংঘাতের রাজনীতির প্রতি তাদের অনাস্থা জানাচ্ছে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন জনগণ আর পছন্দ করছে না। অতীতের অগণতান্ত্রিক রীতি ভেঙে বের হয়ে এসে একটি নতুন জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার যে গণদাবি তার প্রতিফলন হিসেবে আমাদের গণতন্ত্রের নবায়ন প্রক্রিয়ার উত্থান ঘটবে বলেই আমি আমার আশা রাখি।

নির্বাচনী রাজনীতিকে 'গণতন্ত্রীকরণের' এই প্রকল্পের নেতৃত্ব কারা গ্রহণ করবে? এ কথা ঠিক যে প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলো নেতা-কর্মীদের ওপর বর্তায়। তারা যতক্ষণে যা বলছেন তা নিজেরা চর্চা না করছেন, ততক্ষণ নিছক বাগড়ম্বরভরে নিজেদেরকে গণতন্ত্রের একক সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন না। সবচেয়ে প্রথমে তাদের নিজেদের দলের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচনী রাজনীতির 'সুসংহত গণতন্ত্রায়ন' সম্ভব হবে। রাজনৈতিক দল ও নেত্রীবৃন্দকে কয়েকটি বিষয়ে ভাবতে হবে।

১. গত সারাবছর ধরে ভয়াবহ সহিংসতার পর আমরা সবাই মনে করি যে, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সহিংসতার কোনো জায়গা থাকতে পারে না। কিন্তু বহু বছর ধরে দল ও নেতা ও কর্মীবৃন্দ সহিংস রাজনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এখন কী উপায়ে তারা এর থেকে বের হবে? বিরোধী দলগুলো যদি রাজপথে সহিংসতা না করে তারা কি অন্য উপায়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে? এ নিয়ে বিরোধী দলগুলোকে সৃজনশীলভাবে ভাবতে হবে।
২. রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপ্তি কতদূর? আমরা খবর কাগজ পড়ে মাঝে মাঝেই এই সব গডফাদারদের খবর শুনি। কিন্তু এই সব গডফাদাররা কি দেশের প্রায় সব নির্বাচনী এলাকায় এবং সব বড় দলের মধ্যেই জোর অবস্থান করে নিয়েছে? যদি তাদের অবস্থান সবখানেই সুদৃঢ়, যদি জনগণ জেনে শুনেই তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করে তা হলে জানতে হবে কেন তারা তা করছে? তারা কি শুধু ভয়ে বা protection -এর জন্য করছে? আমরা না জানলেও দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা নিশ্চয়ই জানেন তাদের কোন কোন এলাকায় কতজন দুর্বৃত্ত দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, এবং দলে তাদের প্রয়োজনীয়তা কী? দুর্বৃত্ত ছাড়া কি দল রাখা যাবে না বা নির্বাচনে জেতা যাবে না? নেতারা কি দূর্বৃত্তদের হাতিয়ার হিসেবে control করতে পারবেন না তারা Frankenstein হয়ে যাবে?
৩. আলোচনা ও সমালোচনা ছাড়া কি গণতান্ত্রিক রাজনীতি করা সম্ভব? নীতি বিসর্জন না দিয়েও কি আলোচনা করে কোনো উপায় বের করা যায় না, যাতে করে সব বিরোধই সংঘাতে পরিণত না হয়? সমালোচনা করা মানেই কি বিরোধীতা করা ? নিজ দলকে কি সমালোচনা করা যাবে না?

সবার শেষে আমি বলব কিছু প্রবাদ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, যেমন politics is the art of the possible, কিংবা politics makes strange bed fellows. দ্বিতীয় প্রবাদের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের রাজনীতিতে দেখতে পাই। এখন আমরা অপেক্ষা করছি প্রথম প্রবাদটির দৃষ্টান্তের জন্য।